নবদিশা

উন্নয়নের এক নতুন দিশার খোঁজে

AHEAD Initiatives

Addressing Hunger, Empowerment And Development

নবদিশা

উন্নয়নের এক নতুন
দিশার খোঁজে

AHEAD Initiatives

Addressing Hunger Empowerment And Development

ভূমিকা

মনুষ্যত্ব এখন একটা প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। উন্নয়ন হারিয়েছে মানবিক মুখ। এই অবস্থায় বিগত কয়েক বছরের সামাজিক ঘটনাবলি নিরীক্ষণ করে এবং নানা মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের অস্তিত্ব ও বেঁচে থাকার সার্থকতা বুঝতে চেষ্টা করেছি। এমন একটি দীর্ঘস্থায়ী ও বাস্তবসম্মত উন্নয়নের প্রক্রিয়া গঠন করতে চাইছি, যার ধারক ও বাহক হবে আগামী প্রজন্ম।

৬০-৭০ দশক থেকে উন্নয়নের বিভিন্ন ধারা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। কিন্তু যাদের জন্য এই উন্নয়নের কথা বলা হয়ে থাকে, তাদের অনেকেরই কাছে তার ফল মনের মতো হয়নি। এর কারণ হতে পারে, ধারাবাহিকভাবে যেসব উন্নয়নের কাজ হয়েছে, সেসব উন্নয়ন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে খুব সীমিতভাবে অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক উন্নয়নের মানদণ্ডে বিচার করা হয়েছে। যদিও খাদ্য, স্বাস্থ্য কিংবা বাসস্থানের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না, তবুও শুধুমাত্র এগুলি নিয়েই তো মানুষের জীবনযাপনের সার্বিক উদ্দেশ্য পূরণ হয় না। সেখানে সামগ্রিক উন্নয়ন স্থান পায় না।

আমাদের বোধহয় উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে মানুষের অন্তর্নিহিত চাহিদাগুলির সাথেও মেলাবার প্রয়োজন আছে, যার মধ্যে দিয়ে মানুষ তার বৌদ্ধিক, মানবিক, নৈতিক এবং আত্মিক (spiritual) সার্থকতা লাভ করবে। অর্থাৎ উন্নয়ন কেবলমাত্র শুধু বাইরের বিষয় নয়, এর একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণও আছে।

একথা মনে রাখা প্রয়োজন, আমাদের সমাজে নানা গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মানুষ আছে। তারা তাদের নিজস্ব চিন্তাধারা ও মূল্যবোধ নিয়ে বেঁচে আছে। এই প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের কাছে উন্নয়ন ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করে। তাই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বৈচিত্রের স্থান পাওয়াটা জরুরি। এই নানা সাংস্কৃতিক বৈচিত্র ও জীবনযাপনের ধারা এক অর্থে তাদের ঐতিহ্য বহন করে।

সমাজ সদা পরিবর্তনশীল। আর তাই নিশ্চিতভাবেই চারপাশের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে এই ঐতিহ্যকে আজকের সময়ের উপযোগী করে তুলতে হবে। কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না যে, এই ঐতিহ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণের সঙ্গে সাধারণ মানুষের নিজস্ব উন্নয়নের উপলব্ধিও জড়িয়ে আছে। সামগ্রিক উন্নয়নের এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তিটা স্বীকার না করার ফলেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নানা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে।

সংস্কৃতি মানবজীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সংস্কৃতির সাথে জড়িয়ে আছে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবনের সার্থকতা। সংস্কৃতির মধ্যেই মানুষ খুঁজে পায় তার স্বতন্ত্র সত্তা (identity)-কে। যে মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক ভাবধারার মধ্যে দিয়ে আমরা জীবনযাপন করে থাকি, সেই সংস্কৃতির মাধ্যমেই আমরা মানুষ হিসেবে শিখি ও উন্নতি করি। অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমরা বুঝেছি যে সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক চিন্তাভাবনা ও মূল্যবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন করে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে শুধু সংখ্যাতত্ত্ব বা বস্তুকেন্দ্রিক পরিবর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না।

আরও স্পষ্টভাবে বলা যায়, উন্নয়ন বলতে আমরা মানব জীবনের সামগ্রিক উন্নয়নকেই বুঝি, যা একদিকে যেমন ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টির খাদ্য, কর্মসংস্থান ও আশ্রয়ের নিরাপত্তা দেবে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মানোন্নয়ন ঘটাবে, অন্যদিকে তেমনই সাংস্কৃতিক চেতনারও বিকাশ ঘটাবে। সভ্যতা তো এভাবেই বিকশিত হয়েছে। মানব সভ্যতার ইতিহাস চর্চা করলেই বোঝা যায়, সমাজে সংস্কৃতির ভূমিকা এমন এক মৌলিক জায়গা নিয়ে আছে যে উন্নয়নের দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়ার সঙ্গে এর শিকড়টা অত্যন্ত গভীরে গাঁথা রয়েছে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রটা বেশ বিস্তৃত। সংস্কৃতি মানে শুধু মনোরঞ্জনমূলক কার্যক্রম বা প্রদর্শন শিল্প নয়। সামূহিক জ্ঞান, আচার, বিশ্বাস, লোকাচার - এসবেরই এক মিলিত পরিচয় হল সংস্কৃতি। এই সবকিছুরই প্রতিফলন ঘটে কোনও জনগোষ্ঠীর ভাষায়, আদবকায়দায়, সম্পদ ব্যবহারের ধরনে, বহির্বিশ্বের

সাথে মিলনে ও তাকে গ্রহণ করার মানসিকতায়। এর সবটাই সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের সঙ্গে জুড়ে থাকলে তবেই তারা সফলভাবে লড়াই করতে পারবে দারিদ্রের সাথে, প্রান্তিকীকরণের সাথে। বেঁচে থাকার কঠিন লড়াইয়ে সংস্কৃতিই মানুষের প্রেরণার মূল উৎস।

এই নতুন ভাবধারার উপর ভিত্তি করে মতামত গঠনের উদ্দেশ্যে আমরা আন্তর্জাতিকভাবে আলোচিত এই বিশ্লেষণমুখী লেখাটি আপনাদের কাছে বাংলাতে নিবেদন করছি। এর শিরোনাম ‘সংস্কৃতি, আত্মিকতা ও উন্নয়ন’। আশা রাখি যে, উন্নয়নের এই ‘নবদিশা’ আমাদের এই বাংলার মাটিতে একদিন স্থান করে নেবে।

সেই লক্ষ্যে আপনাদের মতামত আদানপ্রদানের জন্য একটি মঞ্চ হিসাবে ভবিষ্যতে ‘নবদিশা’ নামে একটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করারও আমাদের ইচ্ছা আছে। আমাদের বিশ্বাস, এর মাধ্যমে আমরা মিলিতভাবে উন্নয়নের ধারাকে নতুন করে ব্যাখ্যা করতে পারবো।

‘অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স’ এর- পক্ষে

আমাদের কথা

'নবদিশা' অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স (AHEAD INITIATIVES)-এর এক বিশেষ উদ্যোগ। যার মধ্য দিয়ে আমরা বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে সার্বিক উন্নয়নের এক নতুন দিশার খোঁজে মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগকে পাথেয় করে পথে নেমেছি। আমরা মনে করি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক উন্নয়ন নিয়ে মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের রূপ দেওয়া যায় না। সেই বিতর্কের সূত্র ধরে আমরা 'নবদিশা' নামে একটি পত্রিকা সূচনা করার অপেক্ষায় আছি।

'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স' (AHEAD INITIATIVES) প্রায় ১০০ বছর ধরে উন্নয়নের বিভিন্ন কাজের অভিজ্ঞতাকে একত্রিত করার ফলে জন্ম নিয়েছে। যার মধ্যে আছে তৃণমূল স্তরে মাঠের কাজ, সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়ন এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের নীতি নির্ধারণের পরিবর্তন।

সাধারণ 'এন জি ও' থেকে 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স' আলাদা, যেহেতু এটি একটি অলাভজনক সংস্থা যা তৈরি হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের 'কোম্পানি এ্যাক্ট ১৯৫৬'-র ২৫ তম ধারা অনুযায়ী, যাতে তার স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা সাধারণ মানুষের মনে বিশ্বাস আনে এবং কাজে অংশগ্রহণ করতে সাহায্য করে। উন্নয়নে 'নবদিশা'র প্রয়াস ছাড়াও 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স'-এর দৈনন্দিন কাজ মূলত গ্রামের দরিদ্র মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা বিষয় নিয়ে। তার অন্যতম কৌশল হল প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও মানুষের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতায়ন।

উদ্দেশ্য

- ক্ষুধা ও খাদ্য সংকটকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে রেখে দারিদ্র কমানো।
- স্থানীয় লোকাচার ও লোকসংস্কৃতির আলোকে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে দেখা ও তার মাধ্যমে শক্তিশালী করা।

- এমন এক সমাজের নির্মাণে নিজেদের নিযুক্ত করা যাতে নানা মত, বিশ্বাস ও সংস্কারের মানুষজন নিজেদের উন্নয়ন নিজেরাই করতে পারে এবং যার মাধ্যমে তারা নিজেদের সাংস্কৃতিক, আত্মিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক চাহিদা মেটাতে পারে।

কাজকর্ম

- স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতায়ন, যাতে সব মানুষের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত হয় ও তাদের নিজস্ব সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে ওঠে এবং তাদের খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জীবনযাপনের অন্যান্য প্রয়োজন পূরণ করে।
- প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্য ও কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করা।
- লোকসংস্কৃতির মাধ্যমকে ব্যবহার করা এবং তার বিকাশ ঘটানো। কারণ সংস্কৃতির মাধ্যমেই নির্ধারিত হয় আমাদের সত্তা, অভিজ্ঞতা, অনুভব ও আত্মবোধ যা দিয়ে আমরা মানুষ হিসাবে নিজেকে উন্নত করি, সমাজের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করি।
- মানুষের পাশে থেকে তাদের সাহায্য করা, যাতে তারা তাদের নিজেদের ক্ষমতা অনুসারে সুস্থায়ী উন্নয়ন প্রক্রিয়া নির্ধারণ করতে পারে ও তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে পারে।
- সমাজ ও শাসন ব্যবস্থায় সেই পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করা যাতে ক্ষমতা, দায়িত্ব, কাজকর্ম প্রধানত তৃণমূল স্তরেই থাকে এবং শুধু প্রয়োজনে স্থানীয় স্তরকে অতিক্রম করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে স্থান পায়।
- মানুষ যাতে স্থানীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করে প্রান্তিকীকরণ ও দারিদ্রের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারে। আমরা মনে করি, সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মধ্যে লুকিয়ে আছে সম্পদ ব্যবহারের ধরন, ভাষা, আদবকায়দা, আত্মিকতা এবং বহির্বিশ্বের সাথে মিলনের ধরন এবং তাকে গ্রহণ করার মানসিকতা।

- উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে এমন একটা সামগ্রিক চিন্তাভাবনা নিয়ে আসা, যেখানে বস্তুগত উন্নয়নের সাথে আত্মিক উন্নয়নও স্থান করে নেবে এবং সব ধর্মমতের মূল সূত্র ধরে মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে যুক্ত করা।

‘অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌সে’র বর্তমান কাজকর্ম গ্রামবাংলার অনাহারপীড়িত মানুষজনকে নিয়ে, ২০০৫-এর সরকারি সমীক্ষা যার উপর বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছে। এই বিষয়টি যাতে বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থারা সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসাবে পালন করে তারও চেষ্টা করা।

এর সাথে শুরু হয়েছে এক প্রচেষ্টা – গ্রামবাংলার বিভিন্ন প্রান্তের সাধারণ মানুষ ও সংস্থার সাথে এক সম্মিলিত উদ্যোগ তৈরি করা। যাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে না জড়ালে সার্বিক উন্নয়ন কখনোই সম্ভব নয়।

সাংগঠনিক তথ্য

‘অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স’ কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকৃত বিশেষ নিবন্ধীকরণ বলে একটি অলাভজনক সংস্থা। যার নম্বর হল (100531)। সংস্থার সি আই এন বা কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নং U 85300 WB 2009 NPL 134655 (2009-2010)।

সংস্কৃতি, আত্মিকতা

ও

উন্নয়ন

Sanskriti, Atmikata O Unnayan
(Cultures, Spirituality and Development)
Abridged from an exposition published by
World Faiths Development Dialogue (WFDD)
33-37 Stockmore Street, Oxford 0X4 1JT United Kingdom

সংস্কৃতি, আত্মিকতা ও উন্নয়ন
‘ওয়ার্ল্ড ফেইথস্ ডেভেলপমেন্ট ডায়ালগ’ (ডব্লিউ এফ ডি ডি)
33-37 স্টকমোর স্ট্রিট, অক্সফোর্ড 0X4 1JT, ইউনাইটেড কিংডম
কর্তৃক প্রকাশিত মূল ইংরাজি রচনা থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে বাংলায় রূপান্তরিত

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ২০০৯

ভাষান্তর ও প্রকাশনা
অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স
৫/১/২/জি, কর্নফিল্ড রোড
কোলকাতা - ৭০০ ০১৯

বিনিময়
দশ টাকা

সূচি

উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এক পরিবর্তিত ভাবধারা

— **পুরোনো ধ্যানধারণা থেকে সরে আসা দরকার :** কোনও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে কোনটি ইতিবাচক বা কোনটি নেতিবাচক, তা কে স্থির করবে ?

— **উন্নয়ন সংস্থাগুলি সংস্কৃতিকে স্বীকার করে :** আরও ব্যাপক লক্ষ্যসাধনের এই দায়িত্ব বাস্তবে রূপায়ণের দিকগুলি কী কী ?

— **আজকের উন্নয়ন ভাবনায় সংস্কৃতির অবস্থান কোথায় :** প্রচলিত সংস্কৃতির প্রতি মর্যাদা কি আধুনিকতার সঙ্গে খাপ খায় ?

— **জনসংস্কৃতিকে জানা :** এই জ্ঞান কীভাবে কাজে লাগানো হবে ?

— **বাস্তব জগতের বিশুদ্ধ অন্তরের কথা :** কীভাবে উপলব্ধি করা যায় ?

জীবনশৈলী রূপে সংস্কৃতি

— **সংস্কৃতির সংজ্ঞা :** সংস্কৃতিকে আমরা কীভাবে বুঝব ?

— **উন্নয়ন এক সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া :** স্থানীয় সংস্কৃতি ও উন্নয়ন একে অপরের পরিপূরক

— **সংস্কৃতির সৃজনীশক্তি :** বিকল্প উন্নয়নের দিশা

— **সংস্কৃতির ব্যবহারের তিনটি মূলমন্ত্র :** কী কী বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার ?

আচরণবিধির লক্ষ্যে

— **আমাদের প্রেরণাকে যাচাই করা ও আত্ম উপলব্ধি :** কেন আমরা উন্নয়ন নিয়ে কাজ করতে চাই ? আমরা কি ভিন্ন সংস্কৃতিগুলি থেকে শিখতে আগ্রহী ?

— **বিনম্রতা, সমানুভূতি ও শ্রদ্ধা :** জনসাধারণের জীবনযাপন ও তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণে আমাদের কি অধিকার আছে ? কীভাবে এই কাজ করা উচিত ?

— **দুর্বল প্রান্তিক মানুষদের চিহ্নিতকরণ :** কে কার হয়ে কথা বলতে পারে ?

সমাজ-সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ করার পন্থা

— **বাস্তব জগতের জটিলতা বোঝা দরকার :** আমাদের প্রচলিত বিশ্লেষণের পদ্ধতি কতখানি কার্যকরী ?

— **স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ক্ষমতা :** উন্নয়ন কর্মসূচিতে মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ কী হতে পারে ?

— **লক্ষণগুলি নজর করা :** মানুষের স্বপ্ন কী ? তাদের বেদনা কী ?

উপসংহার

— **বিশ্বায়নের মানবিকীকরণ :** মানুষের স্বাধীনতার পথ কী ?

— **সাংস্কৃতিক পৃথকীকরণ নয়, বিশ্বায়নের একীকরণও নয় :** একতার মধ্যে ভিন্নতাকে বাঁচিয়ে রাখতে বিশ্বায়নের শক্তিকে কীভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে ?

উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এক পরিবর্তিত ভাবধারা

পুরোনো ধ্যানধারণা থেকে সরে আসা দরকার : কোনও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে কোনটি ইতিবাচক বা কোনটি নেতিবাচক, তা কে স্থির করবে ?

১৯৫০-৬০-এর দশকে শিল্পোন্নত দেশগুলির সরকার ও প্রতিষ্ঠানগুলি 'উন্নয়নশীল দেশগুলি'র উন্নয়ন কীভাবে হবে তার পরিকল্পনা নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করে। না, তারা মোটেই উন্নয়নশীল দেশগুলির সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার সামগ্রিক মানোন্নয়ন নিয়ে ভাবেনি। পৃথিবীর উত্তরের ধনী দেশগুলির বৈষয়িক উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত দিকগুলির সরাসরিভাবে লক্ষ্যপূরণ করাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। এর ফলে ইতিহাসকে একমুখী সরল বিবর্তন হিসেবে দেখা হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনেক উন্নয়ন পরিকল্পনাকেই প্রভাবিত করেছে, যা নিছক 'আধুনিকতা'কে 'অনুকরণ করা'র একটা উপায় বলেই ভাবা হয়েছে।

এই প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক বিকাশের গুরুত্ব এবং উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিশেষজ্ঞদের মুখ্য ভূমিকাই প্রাধান্য পেয়েছে। প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার মধ্যে দিয়ে শুধু তত্ত্বগতভাবে বিশ্বজগতকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। উন্নয়নের এই দর্শন প্রকৃত বাস্তব থেকে একেবারেই আলাদা, যা আত্মিক (spiritual) জগতকে বস্তুজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

আমরা যদি উন্নয়ন সংক্রান্ত লেখাপত্র একটু ঘাঁটাঘাঁটি করি তাহলে দেখতে পাবো, উন্নয়নের সাংস্কৃতিক দিকটির কথা উল্লেখ প্রায় নেই বললেই চলে, থাকলেও তা তেমন গুরুত্ব পায়নি। আত্মিক বিষয়গুলির উল্লেখ নেই বলেই স্পষ্টত বোঝা যায় যে আত্মিকতা (spirituality) -র থেকে বৈষয়িক বা আর্থিক উন্নয়নকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আত্মিকতা বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষের বিশেষত হতদরিদ্র মানুষের জীবনধারা ও অবলম্বনের মূল উৎস হওয়া সত্ত্বেও এমনটাই ঘটেছে।

বিগত দু'দশকের বেশি সময় ধরে দেখা গেছে যে, উন্নয়নের এই দিশা বহু সমাজ ও গোষ্ঠী কাঠামোকে ধ্বংস করে ফেলেছে। একই সাথে উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলি ও তাদের পরিচালকদের সাংস্কৃতিক রীতিনীতি দুনিয়ার সবাই মেনে নেবে বলে ভেবে নিয়ে বাইরে থেকে আরোপ করা হয়েছে। এমন দু'টি উদাহরণ হল - ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার তুলনায় প্রতিযোগিতাকেই বেশি উৎসাহিত করা, যা বিশ্বজনীন নীতি বলে তুলে ধরা হয়েছে। এর ফলে যাদের প্রচলিত প্রথা, মূল্যবোধ ও রীতিনীতি এগুলি মেনে নেয়নি, সেইসব মানুষের সুস্থায়ী জীবন-জীবিকা প্রায়শই বিপন্ন হয়েছে।

এইভাবে প্রথাগত জীবনযাত্রা ধ্বংসের সবচেয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে আদিবাসী জনজাতিদের মধ্যে দেখা যায়। আর এই তথাকথিত 'আধুনিকতা'র অনুপ্রবেশের মাশুল গুণতে শুধু আদিবাসী জনজাতি সংস্কৃতিই সঙ্কটের মুখে পড়েনি, অনাদিবাসী সমাজের মানুষকেও এর ফল ভোগ করতে হয়েছে। যেমন, আমাদের দেশে আদিবাসী গোষ্ঠীর বাইরেও অনেক মানুষ আছে যারা এই পশ্চিমী মূল্যবোধ ও জীবনধারার প্রবল বিরোধিতা করছে। কারণ এই পাশ্চাত্য মূল্যবোধের দ্রুত প্রসারের সাথে সাথে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির মধ্যে লালিত অনেক মূল্যবোধের, বিশেষত তাদের আত্মিক বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কিত আচার-ব্যবহার ও প্রথাকে জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে।

বর্তমানে মানব সমাজের উন্নতি বিধানে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন পথ গ্রহণ করা যেতে পারে বলে সচেতনতা বাড়ছে, যদিও তা সম্ভবত যথেষ্ট নয়। সমাজের সাংস্কৃতিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধের মধ্যে গভীরভাবে গাঁথা না হলে কোনও উন্নয়নমূলক কর্মসূচিই ইতিবাচক ও দীর্ঘমেয়াদী সুফল আনতে পারে না। আশার কথা হল, সাধারণ মানুষের মুখ্য ভূমিকা, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আচার-ব্যবহার, মানসিকতা, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আত্মিকতা, ধর্মীয় অনুভূতি ও সুখের অনুভূতি এবং এর সাথে তাদের নিজেদের দক্ষতা, ব্যবহারিক জ্ঞান ও সৃজনশীলতা উন্নয়ন কর্মসূচির সাফল্যের পূর্বশর্ত হিসাবে ক্রমশই স্বীকৃতি পেতে শুরু করেছে।

শুধুমাত্র বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি হলেই যে সম্পূর্ণ মানুষ হওয়া যায় না, একথা সব ধর্মই সত্য বলে মেনে নিয়েছে। একমাত্র পেটের খিদে মিটিয়েই মানুষ বাঁচে না - এই ধারণা শুধু খ্রিস্টান ধর্মের নয়। মেক্সিকোর 'মায়া' নামে প্রাচীন এক আদিবাসী জনজাতির একজন সাধারণ মহিলার মুখেও একথা শোনা যায় : 'উন্নততর ভবিষ্যতের জন্য আমাদের লড়াইয়ের প্রেরণা, আমাদের চেতনার প্রাণ হল আমাদের সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে মর্যাদার সাথে জীবনধারণ। আমাদের সংস্কৃতিই বলে যে আমাদের রুজিরোজগার, বৈষয়িক কাজকর্মকে সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন থেকে আলাদা করা যায় না। শুধুমাত্র অর্থনীতির বিষয় বলে একে খাটো করা যায় না।'

জীবনের যে দিকটা দেখা যায় না, অর্থাৎ ভাবগত দিকগুলির উপর গুরুত্ব দিতে কেউ কেউ সেগুলিকে যেন জাগতিক বঞ্চনার এক রোমান্টিক ভাবনা হিসাবেই ব্যাখ্যা করে। কিন্তু কোনও কোনও সমাজের মানুষ আবার প্রথাগত জীবনধারার সেইসব অন্ধকার দিকগুলিও আঁকড়ে ধরে থাকে, যেগুলি মানুষের মৌলিক স্বাধীনতা ও মর্যাদাকে অস্বীকার করে এবং যা সামাজিক ন্যায় ও সমতার বিরোধী। যেমন, অনেক সংস্কৃতিই লিঙ্গ, জাতপাত, বর্ণ ও ধর্মের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করে। এই সংস্কৃতি অবশ্যই পাল্টানো দরকার এবং পাল্টানোও সম্ভব। কিন্তু তাই বলে এইসব সংস্কৃতিকে হেয় করে নিচু নজরে দেখার যে হঠকারী প্রবণতা বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে সাধারণত দেখা যায়, তা মেনে নেওয়া যায় না। এই পণ্ডিতেরা অন্যান্য জনসংস্কৃতিগুলিকে এমনভাবে বিচার করেন যেন তাঁদের নিজস্ব ধ্যানধারণাগুলি সামাজিক মূল্যবোধের ঊর্ধ্বে বাস্তব জগৎ সংসারের বাইরে কোনও কল্পলোকে গড়ে উঠেছিল।

সংস্কৃতি নিয়ে বিতর্কে যে প্রশ্নটা বার বার উঠে আসে তা হল, কোনও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে কোনটি ভালো বা ইতিবাচক আর কোনটি মন্দ বা নেতিবাচক, তা কে স্থির করবে? এবিষয়ে আমাদেরই দেশের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের মতামত হল- মানুষই তাদের নিজেদের অগ্রাধিকার ঠিক করবে। 'হাজার হাজার বছর ধরে অনেক প্রথাগত সমাজে যে নিদারুণ দারিদ্র, দুরবস্থা বা স্বল্পায়ু জীবনের সমস্যা রয়ে গেছে, তার থেকে মুক্তি পেতে যদি কোনও প্রথাগত জীবনযাত্রাকে ছাড়তে হয়,

তাহলে সেই সমাজের মানুষ যারা এই জীবনধারার সাথে সরাসরিভাবে জড়িত, তারা কোনটি বেছে নেবে তা ঠিক করার সুযোগ তাদেরই থাকবে।'

গাম্বিয়ার 'স্টেট ফর ট্যুরিজম অ্যান্ড কালচার'-এর সচিব সুজান ওয়াফা-ওগু বলেছেন - 'আমাদের সব সামাজিক রীতিনীতি, মূল্যবোধ, প্রথা ও বিশ্বাসই যে উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যায় এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু বহু শতাব্দী ধরে এগুলি মানুষকে একসাথে ধরে রাখতে সাহায্য করেছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিক সম্পর্কের ভিতকে মজবুত করেছে। এগুলি এমনই মহোত্তম মূল্যবোধের সমাজ ব্যবস্থা যে, আধুনিকতা ও উন্নয়নের অগ্রগতি ঘটা সত্ত্বেও আগামী প্রজন্মের জন্যে এগুলি সযত্নে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। এখানেই মানুষের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা উন্নয়নের সম্পর্কের সেতুটি রয়েছে, যা মানুষের জীবনে পরিপূর্ণতা এনে তাদের জীবনযাত্রার মানের দীর্ঘস্থায়ী উন্নতি ঘটাতে পারে।'

উন্নয়ন সংস্থাগুলি সংস্কৃতিকে স্বীকার করে : আরও ব্যাপক লক্ষ্যসাধনের এই দায়িত্ব বাস্তবে রূপায়ণের দিকগুলি কী কী ?

বর্তমানে মূল ধারার প্রচলিত উন্নয়নের বিষয়সূচির অন্যতম উপাদান হিসাবে উন্নয়নের সমাজ-সাংস্কৃতিক দিকগুলিও গৃহীত হয়েছে। ১৯৯৫ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রাক্তন সচিব জেভিয়ার পেরেজ দ্য ক্যুইলারের সভাপতিত্বে 'ওয়ার্ল্ড কমিশন অন কালচারাল ডেভেলপমেন্ট' ইউনেস্কোর সাথে যৌথভাবে বিশ্বে বিভিন্ন সংস্কৃতির অবদানের গুরুত্বের উপর 'আমাদের সৃজনশীল বৈচিত্র্য' শিরোনামেএকটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

'রাষ্ট্রসঙ্ঘের উন্নয়ন কর্মসূচি' তাদের ২০০০ সালে দারিদ্রের উপর প্রতিবেদনটিতে 'দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচির নতুন প্রজন্ম'-এর উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেখানে শুধুমাত্র আয় বাড়ানোর কাজকর্মে মনোযোগ না দিয়ে সাধারণ মানুষ যাতে নিজেরাই নিজেদের চাহিদা ও উন্নয়নে অগ্রাধিকারের কথা স্পষ্টভাবে বলতে পারে, তার জন্য সামাজিক সংগঠন গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়।

কয়েক বছর আগে ‘উন্নয়নমূলক প্রকল্পে সমাজবিদ্যার জ্ঞানের প্রয়োগ’ বিষয়ে প্রকাশিত বিশ্ব ব্যাঙ্কের একটি প্রতিবেদনে সমাজ-সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তার কথা সরাসরি স্বীকার করা হয়। ‘আর্থিক বিকাশ কর্মসূচিতে সামাজিক বিশ্লেষণ বা সমাজ সমীক্ষা না করা এবং সামাজিক জ্ঞানকে সামিল না করার জন্য যে অচিরেই বেশ ভালো খেসারত দিতে হয়’ - সে বিষয়ে এই প্রতিবেদনটিতে যেভাবে সতর্ক করা হয়েছে তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় ৫৭টি উন্নয়নমূলক প্রকল্প সমীক্ষা করে এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়। এইসব প্রকল্পের পরিকল্পনায় সমাজ ও সংস্কৃতির উপযোগিতা বা অনুপযোগিতার সাথে প্রকল্পগুলির রূপায়ণের সময়ে (অডিটের সময়ে) প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত আর্থিক লাভক্ষতির হারের তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়। দেখা গেছে যে, সমাজ-সাংস্কৃতিকভাবে উপযোগী উন্নয়ন প্রকল্পগুলিতে অনুপযোগী প্রকল্পগুলির তুলনায় দ্বিগুন হারে লাভ হয়েছে।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক কিছু নথিপত্রে, যেমন ‘বিশ্বের উন্নয়ন রিপোর্ট - ২০০০/২০০১’ ও ‘দরিদ্র মানুষের কন্ঠস্বর’ (ভয়েসেস অফ দ্য পুওর) ইত্যাদি প্রতিবেদনগুলিতে দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের মর্যাদা, স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক পরিবেশের মুখ্য ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দিয়ে এইসব ভাবগত ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলির দিকে ক্রমশই আরও বেশি করে নজর দেওয়া হচ্ছে।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রতিবেদনে মানুষের চাহিদাভিত্তিক সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক উন্নয়নমূলক কাজকর্মের প্রচলিত ধারার পুনর্গঠনের কাজে উন্নয়নের বিভিন্ন দিকগুলির উপযোগী সমাধানই আজ অন্যতম চ্যালেঞ্জ। পরিশেষে বলা হয়েছে, ‘ইতিহাস বলে যে, সব কিছুই এক ধাঁচের হওয়াটা ঠিক নয়। সামাজিক সংগঠন ও মানুষের সামাজিক সক্ষমতার সাথে স্থানীয় পরিবেশই উন্নয়নকে স্থির করে।’

আজকের উন্নয়ন ভাবনায় সংস্কৃতির অবস্থান কোথায় : প্রচলিত সংস্কৃতির প্রতি মর্যাদা কি আধুনিকতার সঙ্গে খাপ খায় ?

এসব কথা আশাজনক হলেও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক বিষয়গুলির গুরুত্ব সর্বজনীনভাবে স্বীকৃতি পেতে এখনও অনেক দেরি। এমনকি যেসব প্রতিষ্ঠানের জননীতির বিষয় থেকে তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে অন্যরকম ধারণা হয়, সেইসব প্রতিষ্ঠানও সংস্কৃতির গুরুত্ব এখনও সেভাবে স্বীকার করে না। অনেক বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও তাদের উন্নয়নমূলক কাজকর্মে সমাজ-সাংস্কৃতিক প্রভাবকে ‘লঘু’ বিষয় হিসেবে ছোটো করে দেখে। এর একটি কারণ হতে পারে যে, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তির দিকগুলি যেভাবে মাপা যায়, সাংস্কৃতিক দিকগুলি তত সহজে মাপা যায় না। কোনও কাজে সংস্কৃতির প্রভাব মূল্যায়ন করা বেশ কঠিন।

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ জেমস উলফেন্‌সন বলেছেন, আমরা সংস্কৃতিকে অগ্রাহ্য করে সর্বনাশ ডেকে এনেছি। সাংস্কৃতিক রীতিনীতির বিষয়টি এখন অনেক বিতর্কেরই মূল বিষয়। এমন অনেক ধরনের আচার-ব্যবহার আছে যা বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বিভিন্নভাবে বিচার করা হয়। যেমন, কারো কারো কাছে সরকারি বা অন্যান্য আধিকারিকদের কিছু ভেট দেওয়া দুর্নীতির লক্ষণ হলেও তা আবার অন্য কারোর কাছে নিছক সামাজিক সৌজন্য বা সাধারণ ভদ্রতার লক্ষণ।

অনেক জ্ঞানীগুণীজন বিশ্বে সংস্কৃতির বহুবিচিত্র রূপকে সমৃদ্ধির উৎস হিসাবে দেখার বদলে বিপদ বলে মনে করেন। তাঁরা মনে করেন যে, সংস্কৃতির বহুরূপতা ও আধুনিকীকরণের মধ্যে একটি সংঘাত তৈরি হবে। যাঁদের কাছে শিল্পোন্নত দেশের বস্তুগত মান অনুকরণ করাই হলো উন্নয়নের একমাত্র লক্ষ্য, তাঁরা অন্যান্য সংস্কৃতির ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক ব্যবস্থা, তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়া, দেশ-কাল-সমাজ, অর্থনীতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি সবকিছুকেই এই ধরনের উন্নয়নের পথের কাঁটা বলে মনে করেন। এঁদের কাছে উন্নয়ন সংস্থাগুলির কাজ হল মানুষের এই ভিন্ন ধরনের সংস্কৃতিকে ‘আধুনিক’ করে তোলা। এমনকি তাদের সংস্কৃতিকে

ধ্বংস করেও তা করতে হবে। আর অবশ্যই এর সপক্ষে আপাতদৃষ্টিতে ন্যায়সঙ্গত বেশ জোরালো যুক্তিও আছে। কারণ বোঝাই যাচ্ছে যে, আধুনিকীকরণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংস্কৃতির সঙ্গে মানুষের প্রথাগত এই সংস্কৃতি ও জীবনযাপনের ধারা আদৌ খাপ খায় না।

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ, তা কে ঠিক করবে ?

এর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ইদানিং সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দেওয়ার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হল যে অনেকেই বুঝতে পারছে, বিশ্ব জুড়ে সীমাহীনভাবে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত কলাকৌশলের যে লাগামছাড়া উন্নতি হচ্ছে, তার ফলে মানব জাতির এবং পৃথিবীর অনিবার্য ধ্বংস ডেকে আনছে। অনেকেই বুঝতে পারছে, গরিব বঞ্চিত মানুষকে অবহেলা করে আমরা ভোগবাদের চরম অবস্থায় তলিয়ে যাচ্ছি। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আধুনিক কলাকৌশল ক্ষুধা ও অপুষ্টিকে দূর করতে পারেনি। এর ফলে ধনীরা আরো ধনী হচ্ছে। গরিবেরা আরো গরিব হয়ে যাচ্ছে। দুনিয়া জুড়ে বাড়ছে অস্থিরতা। সামাজিক অন্যায়, প্রাকৃতিক দূষণের মতো নানা সংকট এই আধুনিক যুগে আরো বেড়ে চলেছে।

এই প্রেক্ষাপটে অনেক মানুষই বুঝতে চেষ্টা করছে যে, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ভাবনা কীভাবে উন্নয়নের ধারাকে সমৃদ্ধ করতে পারে, একে অপরকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তার মানে এই নয় যে, আধুনিক বিজ্ঞান যে সুযোগসুবিধাগুলো এনে দিয়েছে তা ত্যাগ করতে হবে। যেমন ধরা যাক, তীব্র অপুষ্টি ও অত্যধিক মৃত্যুর হার অবশ্যই আমাদের দূর করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন হলে 'প্রযুক্তি' ও 'আধুনিক' কলাকৌশলও ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি হল, বঞ্চিত, অনুন্নত মানুষেরা যাতে বুঝতে পারে যে, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে এমন অনেক কিছু জড়িয়ে আছে যেটা তাদের সংস্কৃতি ও জীবনধারার উপর প্রভাব ফেলতে পারে। এর সুফল সম্পর্কে যাতে তারা নিজেরাই সচেতন হয়ে উঠতে পারে তার জন্য পরিকল্পনাকারী ও প্রশিক্ষকদের দায়িত্ব নিতে হবে। তাদের সংস্কৃতি ও জীবনধারার উপরে এই উন্নয়ন

পরিকল্পনার প্রভাব ও তার ভালোমন্দ ফলাফল সম্পর্কে মানুষকে পরিষ্কারভাবে বোঝাতে হবে।

জনসংস্কৃতিকে জানা : এই জ্ঞান কীভাবে কাজে লাগানো হবে ?

ইদানিং অনেকেই সংস্কৃতির প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছেন। কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে জানাবোঝার এই আগ্রহের পিছনে অনেক কারণ লুকিয়ে আছে। বহুক্ষেত্রেই বাইরে থেকে আমদানি করা 'উন্নয়ন' পরিকল্পনায় কোনও জনগোষ্ঠীকে সামিল করতে তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে আংশিক জ্ঞানকে কাজে লাগানো হয়েছে। এমনকি অবাস্তব এই 'উন্নয়নে'র পথে সুফল আসবে বলে মানুষকে ভুল বোঝাতেও কাজে লেগেছে। এইভাবে সংস্কৃতিকে যান্ত্রিকভাবে ব্যবহারের মধ্যে না রেখে, প্রয়োজন হচ্ছে দরিদ্র, বঞ্চিত মানুষের অবস্থানকে আন্তরিকভাবে বোঝা। একে অপরের কাছ থেকে শেখাই হওয়া উচিত উন্নয়নকর্মীর মূল মন্ত্র। যাতে সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক ভিত্তিতেই তাদের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হয়ে ওঠে।

এই আংশিক সাংস্কৃতিক বোধের অপব্যবহারের বহু উদাহরণ আছে। যেমন, অনেক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির মধ্যে সকলে মিলে একজোট হয়ে কাজকর্ম করার একটা সামাজিক ঐতিহ্য দেখা যায়। সেটাকে ব্যবহার করে অনেক এনজিও রাষ্ট্রীয় আইনসিদ্ধভাবে রোজগার বাড়ানোর জন্য সমবায় গঠন করেছিল। কিন্তু সমস্যাটা হল, সমবায়ের মধ্যে সম্পর্কটা ছিল শুধুমাত্র আর্থিক লাভ-লোকসানের উপর ভিত্তি করে। আর সেই সমাজে সমষ্টিগতভাবে কাজ করার প্রবণতার ভিতটা ছিল গোষ্ঠীগত সামাজিক সম্পর্কের উপর দাঁড়িয়ে। তাদের প্রথাগত এই সামাজিক বন্ধনে পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতার দিকটি এনজিও কর্মীরা ঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারেননি। তাই সমবায় গড়তে গিয়ে অনেকক্ষেত্রেই তাঁরা সামাজিক সম্পর্কগুলি নষ্ট করে ফেলেন। এর ফলে দেখা দেয় সন্দেহ, অবিশ্বাস, প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব।

আবার অন্যদিকে সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক ভিতটা বুঝতে পেরে তাদের উন্নয়নে

এক প্রগতিশীল ধারা আনাও সম্ভব হয়েছে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতায়ন ঘটেছে। উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে সাধারণ মানুষ নিজেরাই নিজেদের আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা মিটিয়ে তাদের নাগরিক অধিকার সুনিশ্চিত করেছে। যেমন, অনেক সংস্কৃতির ধর্মীয় বা গোষ্ঠী নেতাদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আধুনিক কৃষি, বাণিজ্য বা চিকিৎসার জ্ঞান আরো বহুগুণ কার্যকরী করে তোলা হয়েছে। যেসব প্রচলিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল, সমাজকে প্রশিক্ষিত করতে সেগুলিকেই কাজে লাগানো হয়েছে। যেমন, সব সমাজেই ধাই-মাদের কমবেশি একটা মুখ্য ভূমিকা আছে। এঁদের প্রাকৃতিক ভেষজ চিকিৎসার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাথে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির জ্ঞান জুড়ে দেওয়াতে সাধারণ মানুষ অনেক উপকৃত হয়েছে।

এইভাবে অন্য কোনও সংস্কৃতির মধ্যে ঢুকতে হলে স্বভাবতই সেই সংস্কৃতির আত্মিক ও ধর্মীয় বিষয়গুলির সম্পর্কে খোলা মনে বিচার করা দরকার। যেকোনও ধরনের উন্নয়নই যে শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত দক্ষতার মধ্যে আটকে থাকতে পারে না, সেই সম্পর্কেও সচেতন থাকা দরকার। শিশুর জন্ম সম্পর্কে ধাই-মাদের বিশ্বাস ও সংস্কার, তাঁদের প্রথাগত আচার-অনুষ্ঠান এসবের প্রতি যদি শ্রদ্ধা না রাখা হতো, তাহলে তাঁদের প্রশিক্ষিত করা সম্ভব হতো না।

আমাদের যুক্তি হল, সংস্কৃতি ও তার ভেতরের আত্মিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস এবং প্রথাগুলি যদি জানা যায়, বোঝা যায়, তবেই এক নতুন রাস্তা বেরোতে পারে, যা নিছক বস্তুগত বা প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়ন ভাবনা নয়। এই উন্নয়নের নীতি সাধারণ মানুষের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে, যা সকলের জন্য সকলেরই আকাঙ্ক্ষিত সাফল্য এনে দিতে পারবে। এইভাবে উন্নয়নের লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যপূরণ করার পদ্ধতির প্রসার ঘটবে। বস্তুজগৎ থেকে ভাবজগৎ বা আত্মিকতাকে, অর্থনীতি থেকে সংস্কৃতিকে, উন্নতির থেকে নৈতিকতাকে আলাদা করে আমরা ভাববো না। পরিসংখ্যান ও গণিতের হিসাবনিকাশের ছকে বাঁধা যান্ত্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনার থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃতি ও মানুষের অন্তরটাকে জানতে ও বুঝতে পারবো।

তাহলে এর থেকে বোঝা গেল যে, বাস্তবক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের নিজেদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বাঁচিয়ে রেখে স্বাধীনভাবে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার সক্ষমতাকে যেসব ‘উন্নয়নমূলক’ কর্মসূচি ধ্বংস করে ফেলে, সেগুলিকে আর মেনে নেওয়া উচিত নয়। কিন্তু এরজন্য ঠিক কী কী উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে, কোনও নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট ছাড়া তা বলা সহজ নয়। তাসত্ত্বেও এর থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার যে, এমন একটা উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি বা দিশা গ্রহণ করতে হবে যা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রের সীমানা অতিক্রম করে মানুষের জীবনধারণের সব দিকগুলিকে সামগ্রিকভাবে দেখবে। আরো একটি বিষয় বোঝা গেল যে, এটি আসলে প্রচলিত উন্নয়নের ধারার থেকে আরো বেশি অংশগ্রহণমূলক একটি প্রক্রিয়া। তাই এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী, উন্নয়নকর্মী ও উন্নয়নমূলক কাজে নিযুক্ত পেশাদার ব্যক্তিদের সাথে আন্তরিকভাবে আলাপ-আলোচনার জন্য অনেক বেশি সময় ও সংস্থানের দরকার হয়। একইসাথে স্থানীয় মানুষের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে জেনে বুঝে তা উন্নয়নের কাজে লাগানোর ব্যাপারে পেশাদার উন্নয়নকর্মীদের আরো বেশি সক্ষমতাও দরকার।

বাস্তব জগতের বিশুদ্ধ অন্তরের কথা : কীভাবে উপলব্ধি করা যায় ?

‘উপলব্ধি করার জন্য মনের দরজাগুলো যদি খুলে যায়, তা হলে সব কিছুই সীমাহীন বলে মনে হয়’। প্রায় দু’শো বছর আগে বিখ্যাত ইংরেজ কবি উইলিয়াম ব্লেক একথা লিখেছিলেন। বিশ্বের যে কোনও প্রান্তের ধর্মীয়, আত্মিক অনুভূতিও এই বিশ্বাসের কথা বলে। বেশিরভাগ ধর্মই বিশ্বাস করে যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই এক বিশুদ্ধ আত্মিক চেতনা রয়েছে, যা বাস্তব জগতেরই অন্তরাত্মা। তা যদি সত্য হয়, তাহলে বাস্তব জগতের সবটুকু বুঝতে হলে মানুষের এই আত্মিকচেতনার কথাও অবশ্যই মনে রাখতে হবে। আত্মিকতা একটা বিশেষ অতীন্দ্রিয় ব্যাপার বলে জীবনের থেকে আলাদা করে রাখা যায় না। মানুষের অন্যান্য গুণাবলী, কাজকর্ম ও জীবনধারার সাথে আত্মিকতার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তাই আলাদা করে না রেখে জীবনের সবকিছুর সঙ্গেই আত্মিকতাকে জুড়তে হবে।

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে সামগ্রিকভাবে উন্নয়নের সম্পর্ক গড়তে হলে আমাদের বিচার-বিশ্লেষণ ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় সব মানুষের সহজাত আত্মিক চেতনাকে স্থান দিতে হবে। প্রচলিত উন্নয়ন ভাবনার সীমাবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও তার অসীম সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে উন্নয়নের সঙ্গে আত্মিকতার নিবিড় আন্তর্সম্পর্ককে গভীরভাবে বুঝতে হবে। এভাবে বুঝতে হলে অন্তর দিয়ে দেখার প্রয়োজন, যা আমাদের মনকে আলোকিত করে। এমন এক চিন্তাভাবনার পথ খুলে দেয় যা বস্তুজগৎ থেকে আত্মিক জগতকে আলাদা করে না। এর মানে যুক্তিহীন হওয়া নয়, বরং যা কিছু ‘অজানা’, যা অনেক ধর্মেই অন্তরের ‘দিব্য অনুভূতি’ বলে মনে করা হয়, সে সম্পর্কে সচেতন হওয়া। অন্যান্য জ্ঞানকে বাদ দিয়ে সবকিছুকেই খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণভাবে দেখার যে গতানুগতিক যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে, তার থেকে বেরিয়ে এসে জীবন ও জগতকে যুক্তি দিয়ে সামগ্রিকভাবে জানাবোঝার এই হল একমাত্র আসল পথ।

প্রচলিত উন্নয়নের তত্ত্ব ও প্রয়োগে ব্যক্তিমানুষের প্রবল বিষয়বাসনা মেটাতে তার একার প্রচেষ্টায় অঙ্কের হিসেবনিকেশ কষে শুধু বিষয়আশয়ের মধ্যেই সুখস্বাচ্ছন্দ্য খোঁজার কথা বলা হয়। এর সঙ্গে বাস্তব জগতের বিশুদ্ধ অন্তরের কথা উপলব্ধি করার ভাবনা সহজে মিলবে না। পেশাদার উন্নয়নকর্মীরা জীবনের আনন্দ, সৌন্দর্য ও আত্মিক দিকগুলোকে বাদ দিয়ে শুধু বৈষয়িক দিক থেকে যেটা উপযোগী সেই মানদণ্ডেই কাজের মূল্যায়ন করেন। তাঁরা আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই সবসময় আটকে থাকেন। তাই বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে কাজের ভার সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার এই কাজটা তাঁদের পক্ষে খুব সহজ হবে না।

কিন্তু এই ভাবনাটা এক মহৎ মানবিক জীবনদর্শন। এটাই সব ধর্মের শিক্ষা ও অনেক দার্শনিক ঐতিহ্যেরই মূল ভাবনা। পতঞ্জলির যোগদর্শন থেকে বাইবেল, জাপানের জেন ধর্ম থেকে সুফিধর্মের মরমিয়াবাদ, এমনকি বহু আদিবাসী জনজাতির ধর্মবিশ্বাসেও আলাদা আলাদা রূপে এই উপলব্ধির কথা আছে। তাই ভিন্ন ভিন্ন জীবনদর্শনকে একসাথে

করে এক প্রাণের সম্পর্ক গড়ে তোলাই সম্ভবত এই সময়ের এক গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। আর এইভাবেই আমরা প্রকৃত সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তির পথের সন্ধান পেতে পারি।

সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের মধ্যেই নিহিত আছে তার আত্মিক ভাবনা। এই ভাবনাকে বুঝতে হলে ভাবনাটিকে জাগিয়ে সে সম্পর্কে সচেতনতা গড়ার মধ্যে দিয়েই কাজ শুরু করা যেতে পারে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, আমাদের মতো একটা তৃতীয় বিশ্বের দেশে অধিকাংশ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের কাছে ধর্ম ও উৎসবের গুরুত্ব যে কতখানি তা আমরা প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারি। জীবন-মৃত্যু, স্বাধীনতা, বিষয়সম্পত্তি, জমিজমা - এই সবকিছুর সঙ্গেই তা জড়িয়ে আছে।

ধর্মীয় দর্শন বা জীবনের আত্মিক উপলব্ধির থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে আলাদা করে বুঝতে পারাটাও দরকার। জগতকে সামগ্রিকভাবে দেখার কথা সব ধর্মের মধ্যেই বলা আছে। এই মূল্যবোধ জ্ঞানলাভের এবং সমাজে মানুষের একসাথে মিলেমিশে থাকার মূলভিত্তি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও একথা সত্যি যে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের জীবনদর্শন মেনে কাজ করতে পারেনি। মানবতার উপর বারবার আঘাত হেনেছে। ধর্মে ধর্মে হানাহানি, কুসংস্কার, জাতিবিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা, জোর করে ধর্মান্তরিতকরণ, ক্ষমতা বা অর্থের লোভে জঘন্য অনাচার ও অত্যাচার সমাজের আর্থিক উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণের পথে এক বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আজকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের দুর্বলতা থেকে বেরিয়ে এসে আমরা কী করে প্রত্যেকটা ধর্মের প্রকৃত বিশ্বাস ও মানবিক মূল্যবোধের জায়গায় সমাজকে আবার ফিরিয়ে আনতে পারি।

জীবনশৈলী রূপে সংস্কৃতি

সংস্কৃতির সংজ্ঞা : সংস্কৃতিকে আমরা কীভাবে বুঝব ?

উন্নয়নের ধারায় সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে নিয়ে আসার অর্থ হল জীবন ও জগতকে সামগ্রিকভাবে দেখার এক পন্থা। তাই উন্নয়নমূলক উদ্যোগে যাঁরা শরিক হবেন, বিশেষত যাঁদের জন্য এই উন্নয়ন, তাঁদের সবাইকে উন্নয়ন পরিকল্পনায় একেবারে শুরু থেকেই সংস্কৃতিকে জড়িয়ে কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে হবে। উন্নয়নমূলক কাজকর্মের নিরিখে সংস্কৃতিকে দেখলে আমরা একদিকে যেমন অনেক সামাজিক চাপ ও জীবনের অনেক কুপ্রভাব থেকে মুক্তি পাবো, অন্যদিকে তা হবে মানুষের একে অপরের সাথে, পাড়াপ্রতিবেশীর সাথে, পরিবেশের সাথে, সর্বোপরি নিজের সাথে আত্মিক সম্পর্কের এক সৃষ্টিশীল ও আনন্দমুখর বহিঃপ্রকাশ।

যে কোনও সংস্কৃতির তিনটি দিক আছে: প্রথম দিকটি হচ্ছে প্রতীকি বা প্রতীকমূলক (মূল্যবোধ, আত্মিকতা, ধর্ম, ধর্মীয় বিধি, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি)। দ্বিতীয়টি হচ্ছে সামাজিক (পরিবারের ও সমাজের কাঠামো, আত্মীয়পরিজন, পাড়াপ্রতিবেশীর সাথে সম্পর্কের ধরন, ব্যবসায়িক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্মের ধরন ইত্যাদি)। তৃতীয় দিকটি হচ্ছে প্রযুক্তিগত (কারিগরি দক্ষতা, ব্যবহারিক জ্ঞান, কৃষি, প্রযুক্তি, স্থাপত্য ইত্যাদি)।

উপরিউক্ত তিনটি দিকের মধ্যে যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে শিল্পকলা, আইন ও ভাষা তারই পরিচয় দেয়।

সংস্কৃতি শুধু অতীতের বিষয় নয়। বাইরের প্রভাবের পাশাপাশি মানুষ সর্বদাই সংস্কৃতির নতুন নতুন দিক উদ্ভাবন করছে। সুতরাং কোনও এক সংস্কৃতিতে কিছু বিশেষত্ব আছে যা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া, আর বাকিটা নির্মিত ও আয়ত্ত করা।

তাহলে সহজ কথায় সংস্কৃতির সংজ্ঞা হল, 'জ্ঞান, বুদ্ধি, মূল্যবোধ, আচার-

ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি এবং অন্যান্য সামাজিক সম্পদের এক জটিল সংমিশ্রণ, যা সেই সমাজের মানুষ তাদের সামাজিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে নিজেদের বিকাশের লক্ষ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে, আয়ত্ত করেছে অথবা নিজেরাই নির্মাণ করেছে'।

উন্নয়ন এক সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া : স্থানীয় সংস্কৃতি ও উন্নয়ন একে অপরের পরিপূরক

উন্নয়নের মাপকাঠি যদি গোড়াতেই মূলত পরিসংখ্যানের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে, তাহলে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সংস্কৃতির গুরুত্ব স্বাভাবিকভাবেই হারিয়ে যাবে। কিন্তু তার বদলে আমরা যদি এই অঙ্কের হিসেবনিকেশ থেকে বেরিয়ে এসে জীবনের গুণগত মানোন্নয়নের কথা ভাবি, তাহলে দেখব যে সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে শুধু আর্থিক ও প্রযুক্তিগতভাবে সামগ্রিক উন্নয়ন হতে পারে না। সংস্কৃতি মানুষের জীবনযাপনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এমনকি জীবনের সার্থকতা ও সুখসমৃদ্ধি বলতে কী বোঝায় তাও কিন্তু স্থানীয় সংস্কৃতি নির্ধারণ করে। সংস্কৃতিই জীবনের চালিকাশক্তি। সাংস্কৃতিক বিকাশের পথে বাধা এলে জীবনে জড়তা আসে। নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে মানুষ পরনির্ভর হয়ে পড়ে।

তাই স্থানীয় সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করা প্রয়োজন, যাতে উন্নয়ন প্রক্রিয়া আরো বেশি শক্তিশালী, কার্যকরী ও সজীব হয়। এর ফলে মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসবে। একে অপরের প্রতি বিশ্বাস গড়ে উঠবে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ আরো জোরালো হবে। তারা নিজেরাই দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে নিজেদের অধিকার সুনিশ্চিত করবে। আর্থিক সাফল্যের সাথে সাথে নতুন নতুন সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে প্রযুক্তির আরো উন্নতি ঘটবে। দারিদ্র আরো সুস্থায়ীভাবে কমতে থাকবে। মেক্সিকোর কবি কার্লোস ফুয়েন্টেস্ বলেছিলেন, 'আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এক সমুদ্রের শাঁখের মতো, যাতে কান পাতলে আমরা শুনতে পাই আমরা কী ছিলাম আর আমরা কী হতে পারি'।

এর থেকে বোঝা যায় যে, উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে অতি অবশ্যই স্থানীয় সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে হবে। নচেৎ উন্নয়নের চিন্তাভাবনা করাই বাতুলতামাত্র। আমরা দেখেছি যে, প্রচলিত শিক্ষার পাঠ্যক্রম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিফল হয়েছে। কারণ মানুষ যা জানতে চায় ও শিখতে চায় তার সাথে এই পাঠ্যক্রমের কোনও মিলই নেই। ফলস্বরূপ বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার নিম্নমুখীই রয়ে গেছে। যারা ভালো ফল করেছে, তারা নিশ্চিতভাবেই তাদের স্থানীয় এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে। কারণ তারা যা শিখেছে তার বাস্তব প্রয়োগ তাদের নিজেদের এলাকায় করা সম্ভব নয়। এমনকি অনেকক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে যা শিক্ষা দেওয়া হয় তা অনেক সংস্কৃতির পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধের বিরোধী। তখন নিজেদের সমাজের চিরাচরিত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ নাকি পরীক্ষায় ভালো ফল করতে বিদ্যালয়ের শিক্ষা, কোনটা তারা গ্রহণ করবে তা নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মনে সংশয় দেখা দেয়।

সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন অবশ্যই সম্ভব। সাংস্কৃতিক চেতনাসমৃদ্ধ শিক্ষা পাঠ্যক্রম গঠনের মাধ্যমে তা করা সম্ভব। এর অর্থ হল, স্থানীয় ভাষায় শিক্ষাদান, স্থানীয় চাষআবাদ ও কলকারখানায় কাজে লাগে এমন ব্যবহারিক জ্ঞান ও কারিগরি দক্ষতা, স্থানীয় ও জাতীয় ভূগোল, ইতিহাস ও সাহিত্য সম্পর্কে পড়াশোনায় উৎসাহ প্রদান।

সংস্কৃতির সৃজনীশক্তি : বিকল্প উন্নয়নের দিশা

প্রচলিত উন্নয়নের প্রক্রিয়া যখন মানুষের মূল্যবোধকে আঘাত করে, তখন স্থানীয় সংস্কৃতি তথাকথিত 'আধুনিকতা' ও 'উন্নয়ন'কে বাধা দেয়। মানুষের এই অসহযোগিতা বা বিরোধিতার ফলে অনেক 'উন্নয়ন' প্রকল্পই বিফল বা ব্যাহত হয়। একথা সত্যি যে, অনেক সময়ে এই 'উন্নয়নে'র ফলে অনেক জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা বিপন্ন হয়েছে। তারা হয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছে, নয়তো এই 'উন্নয়নে'র থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আবার অনেকে কখনো ভয়ে, কখনো বা পুরোনোকে আঁকড়ে ধরে থাকার অন্ধ গোঁড়ামির জন্যে বা ভুল বোঝার কারণেও বাইরে থেকে আরোপ করা নতুন কোনও প্রক্রিয়াকেই প্রত্যাখ্যান করেছে। পাশাপাশি এমনও অনেক সংস্কৃতির

উজ্জ্বল উদাহরণ আছে, যেখানে হাতেকলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নতুন নতুন উদ্ভাবনের মধ্যে দিয়ে উন্নয়নের বিকল্প ধারা গড়ে উঠেছে।

কীভাবে সংস্কৃতির ভিত্তিতে উন্নয়নের ধারা নির্ধারিত হতে পারে, তার কোনও সহজ সরল একটাই পথ নেই। বিভিন্ন জায়গায় দেখা গেছে স্থানীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণে এবং তাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার মেলবন্ধনে নতুন নতুন চিন্তাভাবনা তৈরি হচ্ছে। অনেক সফল উন্নয়ন প্রক্রিয়া দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এভাবেই ঐতিহ্য ও আধুনিকতার চিরকালীন দ্বন্দ্ববিবাদ থেকে বেরিয়ে এসে বিভিন্ন সংস্কৃতির সৃষ্টিশীল ভাবনার মিলনের মধ্যে দিয়ে স্থানীয় সংস্কৃতির আধুনিকীকরণের এক নতুন ভাবধারার বিকাশ ঘটতে পারে। যেমন, মেক্সিকো শহরের প্রান্তে স্থানীয় হাটবাজারে ছোটো ছোটো ব্যবসায়ীরা এক বিকল্প প্রথাগত ‘মুদ্রা’ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। তারা অর্থের পরিবর্তে নিজেদের মধ্যে জিনিসপত্র ও পরিষেবার আদানপ্রদানে বেচাকেনা করে। কোনও জিনিস কিনতে হলে ক্রেতা টাকাপয়সার বদলে বিক্রেতার কোনও কাজ করে দেয়। ঘন্টা হিসেবে কাজের মূল্য ধরে বিক্রেতা তাকে জিনিসটি দিয়ে দেয়। এই বিনিময় প্রথা এমনই এক অভিনব স্থানীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে জিনিসের দাম ও আর্থিক লাভ-লোকসানের থেকে মানুষের শ্রমের মূল্যকেই বড় করে দেখা হয়। এরকম হাজারো বিকল্প বাণিজ্যিক লেনদেনের ব্যবস্থা সারা বিশ্ব জুড়েই ছড়িয়ে আছে।

বিশ্বায়নের অর্থনীতি সর্বদাই গরিব মানুষের জীবন-জীবিকার ক্ষতি করে। স্থানীয় অর্থনীতির এই প্রচলিত ব্যবস্থাগুলি বিশ্বায়নের অর্থনীতির প্রসারকে বাধা দেয়। আফ্রিকা মহাদেশের কঙ্গোদেশে (পরে জাইরে দেশে) একটি এনজিও প্রকল্প চাষের জমিতে বলদে টানা হালের ব্যবহার চালু করতে গিয়ে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। এর কারণ তারা স্থানীয় চাষিদের মধ্যে তথাকথিত ‘আধুনিক’ চাষাবাদের অভ্যাস গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিল। এই ব্যবস্থায় চাষিদের শুধু নিজের নিজের পরিবারের জন্য আয় বাড়াতেই উৎসাহ দেওয়া হত। চাষের যন্ত্রপাতি কেনার জন্য চাষিদের যে লোন দেওয়া হত, তাও তাদের নিজের নিজের উপার্জনের টাকাতেই শোধ করতে হত। সমাজের আর পাঁচজনের

কোনও সাহায্য মিলত না। ফলে ফসলের উৎপাদন যতটা বাড়বে বলে আশা করা হয়েছিল, তা হল না। হতাশ হয়ে বেশিরভাগ চাষিই এই প্রকল্পের কাজ ছেড়ে দিল।

পরবর্তীকালে ওই দেশেরই আরেকটি জনগোষ্ঠীর একটি ঘটনা এই এনজিও কর্মীদের খুব অবাক করেছিল। নাগরিক সভ্যতা থেকে বহুদূরে বসবাস করলেও প্রাচীন ওই জনগোষ্ঠীটির এক সজীব ও সমৃদ্ধ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্য ছিল। তারা তাদের গোষ্ঠীর দুজন যুবককে আধুনিক উন্নত কৃষি-প্রযুক্তির ব্যবহার শিখতে শহরে পাঠিয়েছিল। তারা গ্রামে ফিরে গিয়ে বাইরে থেকে আর্থিক বা অন্য কোনওরকম সাহায্য ছাড়া নিজেরাই তাদের শিক্ষাকে সফলভাবে কাজে লাগিয়েছিল। আসলে তারা চাষাবাদের নতুন কলাকৌশলকে তাদের প্রথাগত স্থানীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে গ্রহণ করেছিল বলেই সফল হয়েছিল। চাষ করে তাদের যা বাড়তি আয় হয়েছিল, তা শুধু নিজের নিজের পরিবারের উপার্জন হিসাবে ভোগ না করে সমাজের সকলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করা হয়েছিল। এইভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। তাই গোষ্ঠীর মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ববিবাদও দেখা দেয়নি।

এমন উদাহরণ আমাদের ভারতবর্ষের মুম্বাই শহরে মহিলাদের সমবায়েও আমরা দেখতে পেয়েছি। এই মহিলাদের যৌথ হেঁশেলে রোজকার রান্নাবান্নার কাজটা তাঁদের হিন্দু ধর্মীয় আবেগের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। তাঁরা যৌথ হেঁশেলটিকে 'মন্দির', রান্নার কাজকে তাঁদের নিত্য 'পূজা-অর্চনা' ও সমবায়ের সব মহিলাকে সেই মন্দিরের 'পূজারিনি' বলে মনে করতেন। সমবায়ের কাজ তাঁদের কাছে এক 'পবিত্র ধর্মীয়' কর্তব্য হয়ে ওঠে। মূলত গরিব ঘরের মেয়েরাই এই যৌথ হেঁশেলটি চালাতেন। তাঁরা ছোটোবড়ো, উঁচুনিচু ভেদাভেদ না করে নিজেদের মধ্যে সমানভাবে কাজ ভাগাভাগি করে নিয়ে সমবায়ের উন্নতির জন্যে সকলে মিলে পরিশ্রম করতেন। এতে সবাই কাজে দক্ষ হয়ে ওঠেন। এই সমবায়ের মধ্যে দিয়ে তাঁদের সকলের শুধু আয়ই বাড়েনি, তাঁদের আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাসও বেড়েছিল। পরে মুম্বাইয়ের বাইরে অন্যান্য শহরেও এই সমবায়ের শাখা গড়ে ওঠে।

এটা মনে রাখতে হবে যে, সংস্কৃতি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি সৃজনশীলতা ও প্রগতির উৎস। কিন্তু বিশুদ্ধতা বা প্রাচীনতা নয়, সংস্কৃতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল এর সৃষ্টিশীলতা এবং বাইরের কোনওকিছুর প্রভাবের ভালোমন্দ যাচাই করে পছন্দ করার ও তাকে নিজের উপযোগী করে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা। সংস্কৃতির আসল শক্তি হচ্ছে যে, এর ফলে মানুষের আত্মসম্মান বাড়ে এবং মানুষ শোষণ ও দমনপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে।

মানুষের নানা কাজকর্মে, যেমন মানুষ যা সৃষ্টি করে আবার মানুষ যা ভোগ করে- সবক্ষেত্রেই সংস্কৃতি নতুন মাত্রা যোগ করে। মানুষের সম্পদ, স্বাধীনতা, জীবন-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, বেদনা-আনন্দ - সবকিছুতেই সংস্কৃতি এক নতুন অর্থ প্রদান করে। এই কারণেই আত্মিকতার সাথে সংস্কৃতির গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

সংস্কৃতির ব্যবহারের তিনটি মূলমন্ত্র : কী কী বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার ?

সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করতে গেলে তিনটি বিষয় মনে রেখে সতর্ক থাকতে হবে। প্রথমত, মনে রাখতে হবে যে, সংস্কৃতি নিয়ে ভাবাবেগে আচ্ছন্ন থাকার কোনও কারণ নেই। সংস্কৃতি নিয়ে রোমান্টিকতা বা ভাববিলাসিতার কোনও অবকাশ নেই। কোনও সংস্কৃতিই আদর্শ নয়, স্থির বা অপরিবর্তনীয়ও নয়। পরিবর্তনশীল এই জগতে সংস্কৃতিও পরিবর্তিত হয়। তাকেও নতুনভাবে উদ্ভাসিত হতে হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই সকল পরিবর্তন সমাজের ভেতর থেকেই আসতে হবে। কারণ এই ক্ষেত্রে বাইরে থেকে আরোপ করা কোনও দর্শনকেই চিরকালের জন্য 'সঠিক' বলে ধরে নেওয়া যায় না।

সামাজিক লিঙ্গবৈষম্যের উদাহরণ নিলেই আমরা দেখতে পাবো যে, নারীপুরুষের সমানাধিকারের প্রশ্নে পশ্চিমী সমাজের সংস্কৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। এ ব্যাপারে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সাথে প্রাচ্যের অমিলও প্রচুর। তবুও লিঙ্গগত দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে এখনও আরো পরিবর্তন ঘটা বাকি আছে বলে আমরা সকলেই জানি। কিন্তু চিন্তাভাবনায় ও সামাজিক আচার-আচরণে এই পরিবর্তন তখনই সম্ভব হয়েছে, যখন তা সমাজের ভেতর থেকে এসেছে।

দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতিকে অর্থনীতি এবং ক্ষমতার সম্পর্কের (পাওয়ার রিলেশনস্) বাইরে বিচার করলে চলবে না। এগুলি প্রত্যেকটাই একে অপরের সাথে সম্পর্কিত এবং একে অপরকে প্রভাবিত করে। সংস্কৃতি জনসমাজের ঊর্ধ্বে থেকে চিরকালের জন্য কোনওকিছুই স্থির করে দেয় না। সংস্কৃতি যেমন স্থানীয় অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে, একইসাথে নিজেও প্রভাবিত হয়। আবার অন্যদিকে এ দু'য়ের ওপরই ক্ষমতার সম্পর্ক ও প্রযুক্তির প্রভাব পড়ে।

তৃতীয়ত মনে রাখতে হবে যে, কোনও একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মধ্যে আবার নানা ধরনের সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী থাকে। বৃহৎ সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠীর চরিত্র দেখে সেই গোষ্ঠীর সবার সম্পর্কে একই ধারণা করে নিলে তা ভুল হবে। বড় গোষ্ঠীর ভেতর ছোটো ছোটো গোষ্ঠীগুলিকে আলাদা করে বুঝতে হবে। যেমন, একই শহরবাসীর মধ্যে আমরা বস্তিবাসীদের দেখি, আবার বিশাল অট্টালিকায় বসবাসকারী মানুষজনও দেখি। বস্তিবাসী ও ধনী নাগরিকদের জীবনধারা, ভাষা, চিন্তাভাবনা, আচার-ব্যবহার, বিনোদন - এসবকিছুর মধ্যেই আকাশপাতাল ফারাক। আবার বস্তিবাসীদের মধ্যেও ধর্ম, জাতপাত, মহিলা-পুরুষ, এমনকি জীবিকা ভেদেও আলাদা আলাদা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণা দেখা যায়।

আচরণবিধির লক্ষ্যে

আমাদের প্রেরণাকে যাচাই করা ও আত্মউপলব্ধি : কেন আমরা উন্নয়ন নিয়ে কাজ করতে চাই ? আমরা কি ভিন্ন সংস্কৃতিগুলি থেকে শিখতে আগ্রহী ?

যুগে যুগে অনেক মনীষীরাই বলেছেন যে, ‘কর্ম’ ভালো হলেও তা যদি অসৎ উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে তাতে কখনোই ভালো ফল হয় না। তাই আমাদের নিজেদের আত্মিক সত্তাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে। অন্তর দিয়ে যাচাই করে জানতে হবে। সর্বোপরি বুঝতে হবে, কেন আমরা উন্নয়ন নিয়ে কাজ করব ? আমরা কি ভিন্ন সংস্কৃতিগুলি থেকে শিখতে আগ্রহী ? কেনই বা আমরা উন্নয়নের কাজে সামিল হয়েছি ?

মহাত্মা গান্ধী বলতেন যে, ব্যক্তিগত আত্মিক উন্নতি ও অন্তরের পরিবর্তনের সাথে সামাজিক পরিবর্তন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। সব ধর্মই এ কথা বলেছে যে, কোনও বড় সামাজিক কাজ করার জন্য আমাদের আত্মিক গভীরতা দরকার। উন্নয়নের কাজে হোক কিংবা সামাজিক-রাজনৈতিক কাজকর্মে, এই সব কথা আজকের যুগেও সমান প্রাসঙ্গিক। ‘নিষ্কাম কর্মে’র সুপ্রাচীন আদর্শ আজকের যুগেও গুরুত্ব হারায়নি। এর মানে হল, নিছক আত্মসন্তুষ্টি, ব্যক্তিগত সম্মান, অর্থ, যশ বা ক্ষমতালাভের জন্য কাজ করা উচিত নয়।

মনে রাখতে হবে যে, আমরা প্রবহমান সময় ও জীবনের স্রোতের মধ্যে মানবিক উন্নয়নের কারিগর মাত্র। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যে নয়, ভোগের আকাঙ্ক্ষায় নয়, আমাদের অন্তরের এক মানবিক প্রেরণার মধ্যে দিয়ে কাজ করতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে এটা নিশ্চয়ই কঠিন। কারণ আমাদের নিজেদের জীবনধারণের সংস্থান, ব্যক্তিগত উন্নতি আর সম্মান কাজের ফলাফলের সঙ্গে জড়িয়ে না থাকলেও উন্নয়নকর্মী ও সংগঠকদের সাধারণ মানুষের দেওয়া টাকা নিয়েই কাজ করতে হয়। তাই কাজের সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে একটা চিন্তা সবসময় থেকেই যায়।

তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের কী করতে হবে ? সৎ উদ্দেশ্যে সৎভাবে নিষ্ঠা সহকারে কাজ করে যাওয়াটাই বোধহয় আমাদের একমাত্র কর্তব্য হতে পারে। যাদের জন্যে এই কাজ তারাই এর ফলাফলের মূল্যায়ন করবে। তারাই স্থির করবে যে কাজের শেষে তারা উপকৃত হয়েছে কিনা, অন্য কোনও উন্নয়নকর্মী বা প্রতিষ্ঠান নয়।

এখন প্রশ্ন হল, যাদের জন্য আমরা কাজ করছি, সেই সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আমরা কি শিখতে আগ্রহী ?

পারস্পরিক আদানপ্রদানের মধ্যে দিয়ে সাংস্কৃতিক মিলনের সম্ভাবনার কথাই এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের বোঝা দরকার যে মানুষের সংস্কৃতি মোটেই শূন্যগর্ভ নয়, বরং বিস্ময়করভাবে সমৃদ্ধ যা আমাদের শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতে হবে। সাধারণ মানুষের সংস্কৃতি এক অসীম জ্ঞান ও দক্ষতার ভাণ্ডার, যদিও তার সঙ্গে কখনো কখনো অনেক ‘মন্দ’ দিকও লুকিয়ে থাকে।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে উন্নয়নমূলক কাজে প্রয়োজনীয় সম্পদের সংস্থান এবং কাজের কুশলী পরিকল্পনা ও রূপায়ণের জন্য দাতা প্রতিষ্ঠানগুলির ও বিশেষজ্ঞদের অবশ্যই দরকার আছে। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় যখন তাঁরা সাধারণ মানুষকে পেছনে ফেলে রেখে এই কাজে নিজেরাই মুখ্য ভূমিকা নেন। নিজেরাই আগে থেকে মানুষের সমস্যার সমাধান করে ফেলেন । ফলে তাঁদের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম বড় বেশি একপেশে হয়ে পড়ে, যা কখনোই স্থায়ী রূপ নিতে পারে না। সত্যিকারের উন্নতি তখনই ঘটবে, যখন শুধুমাত্র উন্নয়নকর্মীরা নয়, দাতা প্রতিষ্ঠান ও দেশগুলিও তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি, দুর্বলতা ও সীমিত ক্ষমতাকে বুঝবে এবং মানুষের কাছ থেকে শিখে তাদের সবার সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে উন্নয়নের কাজে সামিল হবে।

ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে তৃণমূলস্তরে কাজ করতে গেলে সেই সংস্কৃতি অনেক সময়ই আমাদের চোখ, মন ও হৃদয় খুলে দেয়। অবশ্য এর জন্য অচেনা এই সংস্কৃতিকে অন্তরের গভীরতা থেকে অনুভব করতে হয়। যদি আমরা মনের মধ্যে লালিত পুরোনো

সব বদ্ধমূল ধ্যানধারণাগুলি ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি, তবেই তা সম্ভব হয়। এর মানে আমাদের অহংকার ত্যাগ করে মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে খোলা মনে সবকিছুকে উপলব্ধি করতে হবে। যে বিশেষজ্ঞরা তা পারেন না, তাঁরা তথাকথিত 'পেশাদারিত্ব' দেখিয়ে যান্ত্রিকভাবে কাজ করতে চেষ্টা করেন । ফলে মানুষের সঙ্গে, তাদের জীবনের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করার অসীম আনন্দ থেকে তাঁরা বঞ্চিত হন।

পরস্পরের সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে বিকশিত সম্পর্কের এই বৃহত্তর প্রেক্ষাপটেই ভবিষ্যতের সামাজিক সংহতির উদ্যোগ গড়ে তুলতে হবে। দয়া নয়, করুণা নয়, সমানুভূতির সাথে পারস্পরিক আদানপ্রদানের মাধ্যমে আত্মজ্ঞান লাভ। সাহায্য নয়, একে অপরকে সমৃদ্ধ করা। এইভাবে পারস্পরিক বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে মানুষের সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করেই এক নতুন ভাবধারা তার স্থান করে নেবে।

বিনম্রতা, সমানুভূতি ও শ্রদ্ধা : জনসাধারণের জীবনযাপন ও তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণে আমাদের কি অধিকার আছে? কীভাবে এই কাজ করা উচিত?

সামাজিক সমীক্ষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা এই সবকিছুই কেমন যেন একটা অনধিকার চর্চা হয়ে যায়, যদি না সেসব সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে করি এবং তা থেকে তারা নিজেরা লাভবান হয়। দূর থেকে সমীক্ষা বা গবেষণা, উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া পরিকল্পনা কিংবা তথাকথিত 'পিছিয়ে পড়া' 'অশিক্ষিত' মানুষকে 'শিক্ষা' দিয়ে উন্নয়নের জন্য উপযোগী করে তোলা - এইটাই অনেক ক্ষেত্রে আজকের গতানুগতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া। কিন্তু এর থেকে আরো ভালো উপায় হতো, যদি আমরা সময় নিয়ে তাদের কাছ থেকে শিখতাম। সাধারণ মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়েই কোনও গবেষণা বা পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে সফল হতে পারে। মানুষকে নিছক গবেষণার বিষয়বস্তুতে পরিণত করা উচিত নয়। তারা নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সবচেয়ে ভালো সমাধান করতে পারে। তাই সমস্যার সমাধান কীভাবে হতে পারে, সেটা যদি তাদের কাছ থেকেই জেনে তার রূপ দিতে পারতাম, তাদের জ্ঞানকেই বাস্তবে কাজে লাগাতে

সাহায্য করতাম তা অনেক বেশি সফল হত।

গবেষণা ও পরিকল্পনার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। কিন্তু তা শুধুমাত্র পেশাগত বা ব্যবহারিক দক্ষতা দিয়ে সম্ভব নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে গবেষকের নিজের আত্মিকতা, নৈতিকতা ও অন্যান্য মানবিক গুণাবলী। পেশাগত দক্ষতার সঙ্গে এই মানবিক দিকগুলিরও সমন্বয় ঘটানো দরকার। 'দারিদ্র'কে শুধুমাত্র বস্তুগত মাপকাঠিতে নয়, আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব দিয়েও বুঝতে হবে। বুঝতে হবে যে, মানুষ যদি সামূহিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করে, তাহলে নিজেদের ও নিজেদের চারপাশের পরিবেশকে নিজেরাই পাল্টাতে পারে। তাই উন্নয়নকর্মীদের মধ্যে আত্মিক গুণ বিকাশের প্রয়োজন, যার মধ্যে থাকবে মানবিকতা, ভালোবাসা, বিনম্রতা, জ্ঞান, ধৈর্য, অধ্যবসায়, শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিষ্ঠা ও উদারতা।

উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অন্যান্য ব্যবহারিক বিষয়গুলির সাথে এই দিকগুলিরও অবশ্যই সমান গুরুত্ব থাকা উচিত। রবার্ট চেম্বার্স নামে এক বিশিষ্ট চিন্তাবিদ এটা বুঝতে পেরে বলেছিলেন, এই বিষয়গুলি আমরা কখনোই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে ধরি না। উন্নয়ন ভাবনায় এইসব মানবিক দিকগুলির কোনও স্থান নেই। এগুলি ব্যক্তিমানুষের বিশ্বাস হিসাবে শুধুমাত্র রাজনৈতিক মতাদর্শ অথবা ধর্মীয় মৌলবাদের নিরিখে আলোচিত হয়।

কোনও জনসমাজের সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে হলে তাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে কাজ করতে হবে। তাদের সঙ্গে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিনিময় করতে হবে। তাদের জীবনযাপনের অংশীদার হতে হবে। সহমর্মিতার সাথে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা বুঝতে হবে। তাদের আত্মিক অনুভূতিকে বুঝতে হবে। তাদের সৌন্দর্য বোধ ও নীতি-নৈতিকতাকে বুঝতে হবে। তবেই প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব। অধৈর্য হলে চলবে না। কিন্তু আমাদের অনেকেরই সময়ের বড় অভাব, যেনতেনপ্রকারে আমরা উন্নয়ন করে ফেলতে চাই। ফলে তা দীর্ঘস্থায়ী নাও হতে পারে। তাই আমাদের এইসব আলোচ্য বিষয় মনে রাখার প্রয়োজন আছে।

দুর্বল প্রান্তিক মানুষদের চিহ্নিতকরণ : কে কার হয়ে কথা বলতে পারে ?

উন্নয়নমূলক কাজের উদ্দেশ্য যদি স্থানীয় সংস্কৃতিকে উপলব্ধি করা এবং সবচেয়ে দারিদ্রপীড়িত মানুষের ক্ষমতায়ন হয়, তাহলে দুর্বল ও প্রান্তিক মানুষদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে আর অন্তর দিয়ে বুঝতে হবে। এমনটা হতেই পারে যে, কোনও সমাজের একটি অংশ উন্নয়নমূলক কাজকর্মের সাথে নিজেদের খুব সার্থকভাবে জড়াতে পারল। কিন্তু অপর একটি অংশ ততটা সাড়া না দিয়ে নিজেদের আলাদা করে রাখল।

যেমন, মহিলাদের ক্ষমতায়ন জাতীয় কর্মসূচিতে অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, মূলত স্থানীয় নেতা ধরনের মানুষেরাই গ্রামের মেয়েদের হয়ে মতামত দিয়ে থাকেন। তাঁরা আবার পুরুষও বটে। তাঁদের কথাই সমাজের সবাই মেনে নেন। এর ফলে দেখা যায় যে, মহিলাদের রোজগার নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পেলেও, তার সাথে তাঁদের বাড়তি কাজের চাপও বাড়ে ।গ্রামের মেয়েদের সমস্যা ও সুবিধা-অসুবিধার কথা তাঁদের মুখ থেকে না শোনার ফলেই এমনটা হয়।

তাই বড় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত ছোটো ছোটো সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সমস্যার কথা আলাদা করে জানতে ও বুঝতে হবে। ক্ষমতার সম্পর্ক, শ্রেণীগত পার্থক্য, লিঙ্গভেদ, ধর্মীয় পরিচয়, বয়সের ফারাক- এসবকিছুই মনে না রাখলে দুর্বল ও বঞ্চিত মানুষদের আলাদা করে চিহ্নিত করা যাবে না। অনেকক্ষেত্রে গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলা মানে গ্রামের বড় রাস্তার আশেপাশে বসবাসকারী মানুষজনের সাথে কথাবার্তাকেই বোঝানো হয়। গ্রামের সচ্ছল শিক্ষিত মানুষ কিংবা মোড়ল-মাতব্বরদের কথাই শুধু শোনা হয়। দুর্বল ও প্রান্তিক মানুষেরা দূরেই সরে থাকেন।

সুতরাং যে উন্নয়নকর্মী গ্রামে কাজ করতে যাচ্ছেন, তাঁকে শুধু গ্রামের সব মানুষকে কথা বলার সুযোগ দিলেই হবে না, সেখানকার মানুষদের আচার-ব্যবহার, জীবনযাপনও লক্ষ করতে হবে। এভাবে সাধারণ মানুষের সাথে সহভাগী হয়ে কাজ করতে পারলে তবেই কাজের সাফল্য আসবে।

সমাজ -সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ করার পন্থা

বাস্তব জগতের জটিলতা বোঝা দরকার : আমাদের প্রচলিত বিশ্লেষণের পদ্ধতি কতখানি কার্যকরী ?

আমরা জানি, বিজ্ঞান পরীক্ষা করে (যেমন, ল্যাবরেটরিতে গিনিপিগের উপর) অথবা পর্যবেক্ষণ করে (যেমন, রাসায়নিক প্রক্রিয়া, আবহাওয়া পরিবর্তন ইত্যাদি)। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞান খুব ভালোভাবে বলতে পারে যে কীসের কারণে কী হচ্ছে। কিন্তু পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক গবেষণা যেহেতু মূলত সংখ্যাতত্ত্বের উপর নির্ভরশীল, তাই তা সবকিছু উপলব্ধি করতে পারে না।

পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সমাজবিদ্যার মধ্যে প্রধান তফাত হল, প্রথমটি যে কোনও বস্তুকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখে, তার অংশ বিশেষ আলাদা করে নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে। কিন্তু সমাজবিদ্যায় এই পন্থা কার্যকরী হয় না। কারণ মানুষের জীবনধারা, আচার-আচরণ ও তার অন্তর্নিহিত গূঢ় অর্থ কখনো অংশবিশেষ হিসাবে দেখে খণ্ডিতভাবে উপলব্ধি করা যায় না। তাই সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে দেখা দরকার।

মানবসমাজের সব কাজকর্ম, এমনকি অর্থনৈতিক লক্ষ্যে নির্দিষ্ট যে কাজ তার সবকিছুই নির্ভর করে মানুষের জীবনে সেইসব কাজ কী অর্থ বহন করছে তার উপর অর্থাৎ এসবেরই মূলে আছে মানুষের সংস্কৃতি। সুতরাং যেকোনও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক কাজই কিন্তু সেখানকার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছে।

কোনও যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিই বাস্তবকে সামগ্রিকভাবে বুঝতে পারে না। এই কারণে আমরা যতই উন্নতমানের প্রশ্নাবলী বা সামাজিক বিশ্লেষণের তথাকথিত ‘আধুনিক’

পদ্ধতি ব্যবহার করি না কেন, তা কিন্তু বাস্তবের এই জটিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকটি ধরতে পারে না। ফলে সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতটা বুঝতে ব্যর্থ হয়।

স্থানীয় সংস্কৃতিকে বোঝার জন্য কোনও সহজ সরল একটাই পদ্ধতি নেই। কাজের উদ্দেশ্যের সঙ্গেই কর্মপন্থা জড়িয়ে থাকে। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন একবার বলেছিলেন যে, তোমার কাছে যদি শুধু হাতুড়ি থাকে, তাহলে সব সমস্যাকেই তুমি পেরেকের মতো দেখবে। মানুষের হৃদয় বা ‘আত্মা’কে কোনও ডাক্তারই তাঁর ছুরি-কাঁচি দিয়ে কাটাছেঁড়া করে ধরতে পারেন না। একমাত্র জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও প্রবল কৌতূহল নিয়ে জানার চেষ্টা করলে তবেই সামাজিক বাস্তবতাকে বোঝা যায়। তাই স্থানীয় সংস্কৃতিকে ভালোভাবে বুঝতে হলে গভীর আগ্রহের সাথে আত্মিক জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে। তার মানে এই নয় যে পুঁথিগত জ্ঞানকে বিসর্জন দিতে হবে। আধুনিক গবেষণার প্রয়োগ-পদ্ধতি ও বিচার-বিশ্লেষণও দরকার, কিন্তু তা কখনোই মানবিক বোধ ও আত্মিক অনুভূতিকে বাদ দিয়ে নয়।

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ক্ষমতা : উন্নয়ন কর্মসূচিতে মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ কী হতে পারে ?

এটা মনে রাখতে হবে যে, মানুষ সবচেয়ে বড় সমস্যা নয়। স্থানীয় জনগোষ্ঠীদের দুর্বলতার সাথে সাথে তাদের শক্তিগুলোকেও চিহ্নিত করতে হবে। তাদের ক্ষমতাকে গুরুত্ব দিতে হবে। শুধু সমস্যা, সংকট, চাহিদা, অভাব-অনটন, বাধাবিপত্তি - এগুলিকেই বড় করে দেখলে স্থানীয় মানুষজনের মধ্যে হতাশা দেখা দেবে। তারা দুর্বল হয়ে পড়বে। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে হাল ছেড়ে দেবে। হাজারো সমস্যা থাকতেই পারে, তার সমাধান করতে হলে সেসব জানাও দরকার। কিন্তু মানুষের সক্ষমতা, সংগ্রাম, সাফল্য, সমৃদ্ধি, সৌন্দর্য, মূল্যবোধ ইত্যাদি জীবনের যা কিছু ভালো দিক আছে, সেগুলোকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে জানতে হবে।

স্থানীয় সমস্যার সমাধান করতে হলে সেই এলাকার মানুষের সাংস্কৃতিক সম্পদকে

উন্নয়নের রূপরেখায় স্থান দিতে হবে। যেমন, ভেষজ চিকিৎসার জ্ঞান, মৃৎশিল্প, তাঁতশিল্পের মতো নানান কারিগরি শিল্পের দক্ষতা, একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা ও সংহতির মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা নিবিড় সামাজিক সম্পর্ক, সাংগঠনিক সক্ষমতা ইত্যাদি এমনই কিছু মূল্যবান সাংস্কৃতিক সম্পদের উদাহরণ। তাই স্থানীয় সাংস্কৃতিক উপাদানগুলিকে অবশ্যই উন্নয়নমূলক কাজের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

লক্ষণগুলি নজর করা : মানুষের স্বপ্ন কী ? তাদের বেদনা কী ?

কোনও এক সংস্কৃতির মানুষজন, কোনও সম্প্রদায় বা কোনও গ্রাম নানাভাবে কথা বলে। কিন্তু নৈঃশব্দেরও ভাষা আছে। নীরবতাও আমাদের অনেক কিছু বোঝায়। তাই কোনও এলাকাকে বুঝতে গেলে গভীর অনুভূতি ও পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন, যাতে সেই এলাকার মানুষের ‘শব্দহীন ভাষা’কে বোঝা যায়। ছকে বাঁধা প্রশ্নোত্তর ও ক্ষেত্রসমীক্ষা তা যতই উন্নতমানের হোক না কেন, সব সময় কাজ দেয় না। অনেক সময় সমীক্ষকের প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর লুকিয়ে থাকে। মানুষ নিজেরা যা বলতে চায়, তা খোলামনে বলতে পারে না। সমীক্ষাতে ঢাকা পড়ে যায় মানুষের চাহিদা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা। প্রশান্ত মহাসাগরের এক প্রান্তে নিউজিল্যান্ডের ‘মাওরি’ উপজাতির আদিবাসীরা যেমন সহজ ভাষায় বলেছিলেন, ‘জানতে চেষ্টা করো, মানুষের স্বপ্ন কী ? তাদের বেদনা কী ?’

তাই কোনও এলাকাকে ভালো করে বুঝতে গেলে স্থানীয় আচার-ব্যবহারের অন্তর্নিহিত গূঢ় অর্থকে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। সমাজ-সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণে প্রশ্নোত্তর বা চেকলিস্টের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। কিন্তু ধরাবাঁধা সেই ছক অতিক্রম করে মানুষের অবচেতন মনে কী লুকিয়ে আছে, যা সহজে জানা যায়না, বোঝা যায় না কিংবা যা প্রকাশ পায় না, তাকেও বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

উপসংহার

বিশ্বায়নের মানবিকীকরণ : মানুষের স্বাধীনতার পথ কী ?

আজকের বিশ্বায়নের মূল কথাই হল, প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এই বাজারকেন্দ্রিক আধিপত্য এবং তার সঙ্গে বহুজাতিক সংস্থাগুলির ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পেতে অনেক মানুষই একটা নতুন সমাজের দিশা খুঁজছেন। যে সমাজের আলাদা একটা মূল্যবোধ থাকবে। বিদেশের এক ধনী কোটিপতি ব্যক্তি বলেছিলেন, বাজার নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ব্যক্তিস্বার্থ পূরণ করে, কিন্তু তা সাধারণ মানুষের সমষ্টিগত স্বার্থ রক্ষা করতে পারে না । তাই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বিশ্বায়নই শেষ কথা নয়। বাজার নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উন্নয়নের একটি উপায় হয়তো হতে পারে, কিন্তু উন্নয়নের বৃহত্তর লক্ষ্যে পৌঁছোনোর দিশা হতে পারে না।

কী সেই লক্ষ্য ? অমর্ত্য সেন বলেছিলেন যে, এই লক্ষ্যকে বলা যেতে পারে মানুষের স্বাধীনতা। কিন্তু দুনিয়া জুড়ে আমরা এখন যা দেখছি সেটা হল, মানুষের স্বাধীনতার সঙ্গে বাজার নিয়ন্ত্রণের স্বাধীনতার সংঘাত। সেখানে বেশিরভাগ সময়ই আর্থিক লাভের কাছে মানুষের চেতনার বিকাশ, সৃষ্টিশীল প্রেরণা ও সামগ্রিকভাবে মানবিক উন্নয়নের প্রচেষ্টার পরাজয় ঘটে।

এই লেখার মধ্যে আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, ‘উন্নয়ন’ বলতে শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা বৈষয়িক উন্নয়নের প্রচলিত ধারণা অধিকাংশ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য তো নয়ই, বরং তাঁদের সংস্কৃতির শিকড় থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। তাই যেসব ‘উন্নয়ন’ প্রক্রিয়ার পরিকল্পনা ও রূপায়ণে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নই প্রাধান্য পায়, সেগুলো আদৌ ফলপ্রসূ হয় না। যাঁরা অন্তরের আত্মিক চেতনার মধ্যে দিয়ে জীবনের অর্থ অনুভব করেন, যা কিছু আধ্যাত্মিক মানুষের কাছে ‘দিব্য অনুভূতি’র ব্যাপার, তাঁরা এই তথাকথিত ‘উন্নয়ন’ মেনে নিতে পারেন না। আর একদিকে আরো

বহুসংখ্যক মানুষ আছেন যাঁরা জীবনযাপনকে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখেন। তাঁরা প্রকৃতির সাথে মানুষের এবং সমাজে একে অন্যের সাথে সহমর্মিতা ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়ে তুলে সহজ সরল জীবনযাপনের মধ্যে দিয়ে মনুষ্যত্বের সার্থক ও পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে চান। তাঁরাও এই উন্নয়নের বিরোধিতা করেন।

মহাত্মা গান্ধী এক সময় বলেছিলেন, সত্যিকারের অর্থনীতি হল ন্যায়বিচারের অর্থনীতি। সব ধর্মের একটি মূল কথা হল, ক্ষমতা ও সম্পদ জীবনের সুখ-শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য আনে না, বিশেষ করে তা যদি অন্যদেরকে বঞ্চিত করে লাভ করা হয়। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে লোভ ও বিষয়আশয় লাভের ওপর নির্ভর করাই হল একমাত্র দুঃখের কারণ। অন্যদিকে ইসলাম, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের কাছে ধনসম্পত্তি ভাগ করাই ছিল তাদের সনাতন ঐতিহ্য এবং অর্থনীতির মূল সূত্র। সামাজিক ন্যায়, প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য এবং মানুষের আত্মিক গভীরতাই হওয়া উচিত মানবিক বিশ্বের মাপকাঠি। স্বাভাবিকভাবেই 'ন্যায়বিচারের অর্থনীতি'র এই ভাবনা রূপায়ণের লক্ষ্যে স্রোতের বিপরীতে এগোনোর জন্য প্রয়োজন হয় মানবচেতনার এক অন্তর্নিহিত শক্তির।

আজকে আমরা নানাধরনের সামাজিক ও প্রাকৃতিক জলন্ত সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি। তাই এই বিশ্বে আমাদের বাঁচতে গেলে জীবনযাপনের আরো সুস্থায়ী প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে, যেখানে মানুষের সত্যিকারের স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র স্থান পাবে। উন্নয়নের আধুনিক কৌশল ও পরিকল্পনারও নিশ্চয়ই ভূমিকা থাকবে। কিন্তু তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল, সাধারণ মানুষের নিজস্ব সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার ও মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাদের স্বাধীন উন্নয়নের পথে বিশ্বায়নের প্রচলিত যে ধারা বাধা দিচ্ছে, তার আমূল পরিবর্তনের চেষ্টা করা। এজন্য ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানিক সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় নানাধরনের উদ্যোগ ইতিমধ্যেই গড়ে উঠছে। এইসব উদ্যোগকে আরো বেশি করে উৎসাহিত করা প্রয়োজন, যাতে মানুষের সার্বিক কল্যাণে কাজে লাগাতে বিশ্বায়নকে একটা মানবিক রূপ দেওয়া যায়।

সাংস্কৃতিক পৃথকীকরণ নয়, বিশ্বায়নের একীকরণও নয় : একতার মধ্যে ভিন্নতাকে বাঁচিয়ে রাখতে বিশ্বায়নের শক্তিকে কীভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে?

বিশ্বায়ন দুনিয়াকে এক সাধারণ মানদণ্ডে দেখে, যেখানে বৈচিত্রের কোনও স্থান নেই। আর অন্যদিকে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া সাংস্কৃতিক বৈচিত্রকে উজ্জীবিত করে। সুস্থায়ী উন্নয়নের জন্য এই দুই আপাত বিরোধী বিপরীত প্রক্রিয়ার সার্থক সমন্বয় ঘটানো দরকার।

একথা সত্যি যে, বিশ্বায়নের ফলে অনেক মানুষই ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের জীবন-জীবিকা বিপর্যস্ত হয়েছে। কিন্তু আবার এই বিশ্বায়নের ফলেই মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ অনেক বেড়েছে। আমরা একে অপরের কাছ থেকে শেখার অভূতপূর্ব অনুকূল এক পরিবেশ পেয়েছি। যেমন, বিশ্বের নানা প্রান্তের তরুণেরা পরস্পরের সাথে মেলামেশার এমন সুযোগ এর আগে কখনোই পায়নি। তেমনি বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে ঐক্য আবিষ্কারের মাধ্যমে এক ধর্মের মানুষের সাথে অন্য ধর্মের মানুষের মিলনের সুযোগও অতীতে এভাবে সম্ভব হয়নি।

সাধারণত সবাইকে একই ধাঁচে গড়ে তোলার জন্যই বিশ্বায়নকে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এরইসাথে ঐক্যের মধ্যে দিয়ে আমাদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের ভিতকে মজবুত করে তোলার জন্যও বিশ্বায়নের সুযোগকে আমরা কাজে লাগাতে পারি। এই বৈচিত্রকে সযত্নে লালন করার কঠিন দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে। অরণ্য সম্পদকে বাঁচিয়ে রাখতে যেমন জীববৈচিত্রের দরকার, তেমনি মনুষ্যত্বকে বাঁচাতে সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের প্রয়োজন।

পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা, আনন্দ, উদ্দীপনা ও গভীর ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে প্রত্যেক জাতিকে অন্য জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে একাত্ম হতে হবে। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি কাজটা সহজ নয়। অচেনা, অজানা নতুন সংস্কৃতির মানুষের সাথে ভাববিনিময় করা কখনো কখনো বেশ দুঃসাধ্যও বটে। কিন্তু

সাম্প্রদায়িকতা, জাতিদাঙ্গা, যুদ্ধবিধ্বস্ত আজকের এই পৃথিবীতে এটাই মানবতার এক মহোত্তম আহ্বান।

বিভেদ নয়, মিলেমিশে সব একাকার করে ফেলাও নয়, একে অপরের সাথে এই আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে তোলাই জীবনের বিকাশের একমাত্র পথ। কোরানে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের দূরদূরান্তে গিয়ে মানুষের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করে সমৃদ্ধ হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য ধর্মীয় বিশ্বাস ও মতাদর্শও এর ওপর গুরুত্ব দেয়। আধুনিক মনস্তত্ত্বেরও এটি একটি মূল কথা। অন্যের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তোলার মানে ব্যক্তিসত্তার কাছে সৎ থেকে নিজেকে অন্যের কাছে সম্পূর্ণভাবে মেলে ধরা। বাস্তবে যারা তা করতে পারে, তারা নিশ্চিতভাবেই জীবনকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

পরস্পরের প্রতি উদাসীনতা বা বিদ্বেষের মধ্যে দিয়ে সাংস্কৃতিক পৃথকীকরণ নয় কিংবা সবকিছুকে একই ছাঁচে ফেলে সংস্কৃতির একীকরণও নয়, একতার মধ্যে বহুত্বই সুস্থায়ী মানবিক উন্নয়নের পথ। তাই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার নতুন ধারা ও জীবনযাপনের নতুন দিশার সন্ধানে আমাদের বিভিন্ন নীতি, ধর্ম, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির মধ্যে সেতুবন্ধনের প্রয়াসে সামিল হতে হবে।

“আমরা গর্ত হতে চাইনা
যেখানে জল জমে থাকে,
আমরা নদী হয়ে উঠতে চাই
যেখানে সকল জলের ধারা মিশে যায়
এবং ইতিহাসের একটা প্রবাহ হয়ে ওঠে”।

‘…মানুষের কাছে যাও
তাদের মধ্যে থাকো
মানুষের কাছে থেকে শেখো
তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করো
মানুষের যা আছে সেটাকেই সমৃদ্ধ করো।
মনে রেখো, …ভালো নেতা সেই
যার কাজ শেষ হয়ে গেলে
মানুষ বলে যে, আমরাই করেছি।’

5/1/2/G Cornfield Road, Kolkata - 700 019, India.